৫

শেখ আবুল ফজল

নোমান আহমদ সিদ্দিকি

মধ্যযুগ-ভারতে ইতিহাসবিদ্যা বিদ্বান ও জ্ঞানীজনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁরা একে স্বগুণে স্বতন্ত্র একটি বিদ্যাবিভাগরূপে লালন ও চর্চা করতেন। তাঁদের কেউ কেউ, যেমন জিয়া-উদ-দিন বরানি (Zia-ud-Din Barani), নিজাম-উদ-দিন আহমদ (Nizam-ud-Din Ahmad), আবদুল কাদির বদাউনি (Abdul Kadir Badauni), মুহম্মদ কাসিম ফরিষ্টা (Muhammad Kasim Ferishta) এবং খাফি খাঁ (Khafi Khan) বিশিষ্ট ঐতিহাসিকরূপে মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনায় অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাস রচনায় পূর্বানুসৃত ঐতিহ্য তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু তাঁদের একেক জনের শিক্ষা প্রাপ্তির ধারা, লব্ধ শিক্ষা, সামাজিক অবস্থিতি এবং ধর্ম ও রাজনীতির প্রতি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হওয়ায় তাঁরা নিজস্ব পন্থায় ইতিহাসবিদ্যায় দৃষ্টিপাত ও একে বিচার করতেন। তাহলেও, এঁদের মধ্যে আবুল ফজল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এবং মধ্যযুগ ভারতে ইতিহাসমূলক রচনার ধারায় তাঁর চিহ্ন রেখে গেছেন।

আবুল ফজলের, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ পদে গণ্য হওয়ার মূল কারণ তাঁর রচনায় বৌদ্ধিক উপাদানের সর্বব্যপী উপস্থিতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তে সর্বদাই যুক্তির পক্ষে তাঁর আবেদন, ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর প্রসারী দৃষ্টি, সে যুগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক ইতিহাস ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা, নতুন পদ্ধতিবিদ্যা যা তিনি গৃহীত কর্তব্যে প্রয়োগ করতে মনস্থ করেছিলেন এবং গদ্য রচনায় তাঁর অনন্য আচার্যসুলভ শৈলী। সবশেষে, ঐতিহাসিকের ভূমিকায়, তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কীর্তি হল *আকবর-নামা* (*Akbar-nama*) ও *আইন-ই-আকবরি* (*Ani-i Akbari*)-র পৃষ্টাগুলিতে আকবরের মহানতার সহজবোধ্য, পূর্ণাকার চিত্র উপস্থাপনে তাঁর সাফল্য।

কেউ বলতে পারেন যে বর্ণিত যুগের ভাবনাকে, বরনি ও বদাউনি আরও উৎকৃষ্টরূপে ধরে রেখেছেন। সেভাবে নিজাম-উদ-দিন ও ফরিষ্টা সফলতর ঐতিহাসিকের স্থান পেতে পারেন কারণ তাঁরা পক্ষপাতহীনভাবে বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং অধিকতর বস্তুসম্মত পথে ও স্বচ্ছ ভঙ্গিতে ঘটনাবলী নথিভূক্ত করেন। স্বীকার করতে কারোরই ইতস্তত করার কথা নয় যে খাফি খাঁ সমাজে বা প্রশাসনিক

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং এই দুইয়ের ভেতর গড়ে ওঠা সম্পর্ক উপলব্ধি ও নথিভূক্ত করার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে কৃতিত্বের পাওনাদার। আবুল ফজল হয়ত ঐতিহাসিকরূপে এই সব গুণের অভাবী, কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য কোনও মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক যুক্তিনিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস বিচার এবং নতুন পদ্ধতি প্রণালী প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, সেগুলিকে পর্যালোচক দৃষ্টিতে যাচাই করে সাজানো ও সংকলনের দাবি করতে পারেন না। এইগুলি ইতিহাসমূলক রচনায় আবুল ফজলের নৈপুণ্যের একান্ত চিহ্ন।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিপুল তথ্য নথিভুক্ত এবং প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা ও বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি সংক্রান্ত বিবরণ সম্বলিত কয়েকটি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করে তিনি ইতিহাসের পরিসর প্রসারিত করেছেন। কঠিন পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাদান সংগ্রহ এবং সযত্নে অনুসন্ধান ও যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বাছাই করে তারপর তিনি তাদের সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল উপায়ে উপস্থাপন করতেন। একটি উৎসের বৈধতা নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সম্পর্কে তাঁর উদ্ভাবিত শর্তগুলি পালিত হলে তবেই তিনি সেই উৎসকে গ্রহণ করতেন। তাহলে, এই অভিমত দান করা যায় যে আবুল ফজলের রচনায় আমরা ইতিহাস-দর্শন অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, তার ব্যাখ্যার নীতি-সূত্র, তথ্য-উপাদান সংগ্রহ ও নির্বাচনের জন্য একটি জিজ্ঞাসামূলক পদ্ধতি-সমষ্টি বিষয়ে নির্দিষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

পূর্ববর্তী অংশে সংক্ষেপে বিবৃত, ইতিহাসবিদের ভূমিকায় আবুল ফজলের কীর্তিরাজি যে কোনও মানদণ্ডে মনে রীতিমত ছাপ ফেলে। তাহলেও, ঐতিহাসিকরূপে আবুল ফজলের স্থান নিরূপণকল্পে আমাদের মূল্যায়নে তাঁর কতগুলি সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাঁর সীমাবদ্ধতার উৎসমূল হল আকবরের প্রিয় সভাসদ ও বিশ্বস্ত সচিবপদে তাঁর অবস্থিতি, তাঁর রচিত ইতিহাসের সরকারি প্রকৃতি, নিখুঁত মানুষ ও আদর্শ নৃপতিরূপে আকবরের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম বা কপট শ্রদ্ধা। আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সভাসদ ও সরকারি ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের পক্ষে আকবরের পক্ষ অবলম্বন, স্বয়ং আকবরের ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ, রাষ্ট্রনীতি ও গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের প্রশংসা করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর নায়ককে একজন ত্রুটিমুক্ত মানুষ ও আদর্শ রাজারূপে উপস্থাপনের তীব্র আগ্রহে তিনি প্রায়শই যুক্তি, অত্যুক্তি-বর্জন ও মিতাচারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এতে তাঁর বিবরণ শুধু একদেশদর্শীই হয়নি কখনও কখনও তা স্তুতিবাদের নিম্নস্তরে অধঃপতিত হয়েছে।

শেখ মুবারকের পুত্র, আবুল ফজল, ১৪ই জানুয়ারি, ১৫৫১, আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ সহজাত মেধার অধিকারী, অল্প বয়সেই তিনি বয়সের তুলনায় অধিক বোধশক্তির পরিচয় দেন। সে যুগের সবচেয়ে কৃতী বিদ্বানদের অন্যতম, তাঁর পিতার প্রযত্নে আবুল ফজল শিক্ষালাভ করেন। শেখ মুবারক তাঁর জ্ঞান, প্রসারিত ও উদার

Scanned with CamScanner

দৃষ্টিভঙ্গি এবং অতীন্দ্রিয় জীবনের প্রতি আসক্তির জন্য বহুজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। শেখ মুবারকের ব্যক্তিত্ব আবুল ফজলের জীবনে প্রগাঢ় ও স্থায়ী প্রভাব ফেলে। অনুত্তীর্ণ কৈশোর আবুল ফজল, পনের বছর বয়সে, *মনকুল* বা জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি নিজেই শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন।

যে ঘটনাবলী আবুল ফজলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্ষমতাশালী *উলমা*-র হাতে তাঁর ও তাঁর পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী উৎপীড়নের যন্ত্রণাভোগ। শেখ মুবারককে মাহ্‌দবি (Mahdavi) এমনকি শিয়া বলে সন্দেহ করা হত। আবুল ফজল অবশ্য তাঁর পিতার বিরুদ্ধে আনীত এই সব অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।[১] প্রায় দু দশক ধরে এই নির্যাতন চলে, এবং পলাতক জীবনযাপনে বাধ্য এই পরিবারের প্রতি কেউ বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়নি, কেউ আশ্রয় কিংবা পুনর্বাসন দিতে এগিয়ে আসেনি। যাই হোক, ১৬৭০ দশকে দুর্দিনের অবসান হয়। ১৫৭৪ সালে আকবর এই পরিবারকে গ্রহণ করে নিরাপত্তা ও পরিপোষণ দান করেন। স্বয়ং আবুল ফজল, ১৫৭৪ সালে, ফৈজির ভ্রাতারূপে আকবর সমীপে পেশ ও বিশেষ অনুগ্রহ সহকারে অভ্যর্থিত হন। কিছুকাল বাদে আবুল ফজল পারিষদরূপে সম্রাটের সরকারে যোগ দেন।

দেখে মনে হয়, সম্রাটের কর্মচারী বাহিনীতে যোগদানের পক্ষে মনস্থির করার পূর্বে আবুল ফজল গভীর ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। পারিষদ গ্রহণ বুদ্ধিমানের ও উচিৎ কাজ হবে কিনা, এ নিয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। সেই যুগের সাধুসুলভ বৌদ্ধিক ধারা রাজকর্মচারী পদ আকাঙ্খার প্রবল বিরোধী ছিল। আবুল ফজলের বৌদ্ধিক অনুরাগ এবং ধ্যান ও সাধনার পথে চরম সত্য উপলব্ধির তীব্র বাসনা, কঠোর তপস্বী দার্শনিকের জীবনযাপনে তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ়তর করে। পারিষদ জীবন ছিল আবুল ফজলের স্বীয় আধ্যাত্মিক তাগিদের পূর্ণ অস্বীকৃতি। তাহলেও, ফৈজি ও শেখ মুবারকের নিরন্তর তাগাদার সাথে পার্থিব উন্নতির সুযোগ ও আশা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল। আবুল ফজল পারিষদ জীবনের বন্ধনে স্বীকৃত হলেন।[২] এটা তাঁর জীবন ও কর্মজীবনের একটা দিক-পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায়। রাজকীয় সারিতে তাঁর পদোন্নতি বিলম্বিত ও দীর্ঘ সময় জুড়ে হয়েছিল। তিনি ২০-এর *মনসবদার* পদে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৫৮৫ সালে একহাজারী পদে উন্নীত হল। ঘটনাক্রমে, পাঁচহাজারী পদপ্রাপ্তির বছর ১৬০২-এর আগস্টে, তিনি যুবরাজ সেলিমের প্ররোচনায় নিহত হন।

কোন পদমর্যাদা লাভ করলেন কিংবা কোন দপ্তরের ভার পেলেন, আবুল ফজলের কর্মজীবনে এগুলি আগ্রহের প্রধান বস্তু হয়নি, তাঁর আগ্রহ ছিল রাষ্ট্রনীতির সূত্রপাত ও রূপায়নে সম্রাটের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তারে। আবুল ফজল সবচেয়ে অর্থপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নিপুণ দক্ষতায় রক্ষণশীল *উলমা*-র বিরুদ্ধে ধর্মীয় আলোচনার সুকৌশল উপযোগে। শেখ মুবারকের পরিবারকে *উলমা*-র হাতে যে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল, তাঁর ও তাঁর পুত্রদের ওপর তা চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়, এতে তাঁরা *উলমা*-

Scanned with CamScanner

র আপোষহীন বিরোধীতে পরিণত হয়েছিলেন। আবুল ফজল ও ফৈজি দক্ষভাবে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন ও উন্নততর বিচারশক্তি প্রয়োগ ও অপরিমেয় বিদ্যার সাহায্যে *উলমা*-কে আকবরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন এবং শেষ অবধি ক্ষমতার আসন থেকে অপসারিত করেন। দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্যের শিক্ষায়তনেই আবুল ফজল সহনশীলতার পাঠ নেন, যা তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তায় গভীর পরিবর্তন আনে ও আকবরের সাথে তাঁর সখ্যের ভিত্তি গড়ে তোলা এবং আবুল ফজলকে ইতিহাস সম্পর্কে নতুন ধারণা জোগায়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দর্শন, তাঁর রচনাবলীতে আদ্যন্ত একটি সূত্ররূপে বিরাজ করেছে। পুনরায় ঐ প্রতিকূল মতগোষ্ঠীই তাঁকে অধ্যায়নে অস্বাভাবিক পরিশ্রমে উদ্দীপ্ত করে যা পরবর্তীকালে তাঁর কাছে মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায় ও সাফল্যের সাথে বিরোধিতার নেতৃত্ব দানে এবং শেষ অবধি রক্ষণশীল *উলমা*-কে ক্ষমতাচ্যুত করতে সাহায্য করে।

১৫৭৫ ও ১৫৮৫ সালের মধ্যবর্তী দশক আকবর রাজত্বের সর্বাপেক্ষা আলোড়নময় ও, একই সাথে, নবগঠনের যুগ ছিল। বিপুল গুরুত্ববাহী বিশালাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিতর্ক আকবরের সামনে আসেঃ ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শাসকের স্থান প্রসঙ্গে মতবিরোধ প্রচণ্ডতম রূপ ধারণ করে। ইবাদৎ খানায় আয়োজিত আলোচনা, সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের পক্ষের শক্তিকে মুক্ত করল। আবুল ফজল যুক্তি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার ভার নিলেন। ঘটনাক্রমে আবুল ফজলের নেতৃত্বাধীন, আকবর সমর্থিত বিরোধী পক্ষ রক্ষণশীল *উলমা*-কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করল; তারা আকবরকে *মুজতাহিদ* (*Mujtahid*) বা *ইমাম-ই-আদিল* (*Imam-i-Adil*) —মুসলমান সম্প্রদায়ের অভ্রান্ত নেতা ও মুসলমান বিধি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসকরূপে স্বীকার করতে বাধ্য হল। রক্ষণশীল *উলমা* তার পদাধিকার ও প্রভাব খাটানোর আসন হারাল। তারা প্রশাসনের ধর্মীয় বিভাগের নিয়ন্ত্রক স্থানগুলি পরিত্যাগ করল। এই বিভাগে কঠোর সংস্কার প্রবর্তনের ফলে *সদ্‌র* (*Sadr*)-এর দপ্তরের মর্যাদা ও ক্ষমতা হ্রাস পেল, এবং রক্ষণশীল *উলমা*-র গোঁড়া সমর্থক *মাদাদ-ই-মাশ* (*Madad-i-Mash*)-এর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি চূরমার হল। এভাবে, শেষ অবধি আবুল ফজল তাঁর মতাদর্শের ও ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেন।

রক্ষণশীলদের পতন সংঘটনে তাঁর প্রেরণা ছিল, একই সাথে, ব্যক্তিগত কারণ ও তাঁর ধারণা যে রক্ষণশীলরা উগ্র ধর্মবিদ্বেষ, প্রচলিত প্রথার অন্ধ সমর্থন এবং যারা তাদের মতে সায় দেয় না তাদের উৎপীড়নের পক্ষে। যে নীতির পক্ষে তিনি *উলমা*-র বিরুদ্ধে লড়তেন সেগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর রচনায় কখনও অনির্দিষ্টভাবে, কখনও বিশদাকারে সুনির্দিষ্ট বিষয়রূপে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচনায় যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল ধর্মীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ, ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মতামত স্পষ্ট করল যা পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয় উপাদান যা তাঁর ঐতিহাসিক রচনায়

Scanned with CamScanner

প্রভাব ফেলেছিল তা হল তাঁর প্রাজ্ঞ শিক্ষণ ও মানসিকতা এবং দার্শনিক অনুসন্ধিৎসায় সমাধানের নানা সম্ভাবনা নিয়ে অনুমান করার ঝোঁক। এগুলি তাঁকে জীবনের অকিঞ্চিৎকর ও নিত্যগ্রাহ্য উপাদানের পরিবর্তে গম্ভীর ও গভীর দিকগুলি বেছে নিতে প্রবৃত্ত করে। পরিণতিতে সর্বজনীন বিবেচনা ও দার্শনিক মনন তাঁর লেখা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং তাঁর ইতিহাসবিদ্যার একটি উপাদান। বৌদ্ধিক অনুরাগ তাঁর রচনার শৈলী ও সাহিত্যমূল্যও নির্ধারণ করেছে। তিনি লিখতে নেমেছেন, *আকবর-নামা*-য় তাঁর উক্তি, সামান্য কিছু বাছাই মানুষের জন্য; তাঁর কিছু এসে যায় না যদি সমকালীন পণ্ডিতবর্গের অধিকাংশ তাঁর ভাষা ও শৈলী অনুধাবন করতে অক্ষম হয়।

আবুল ফজলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দুটি কারণে মনোযোগ দাবি করে। প্রথমত, তাঁর ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাছাইয়ে তারাই নির্ধারকের কাজ করে। দ্বিতীয়ত, তারা বিষয় বস্তু বিচারকেও প্রভাবিত করে। এটা ঠিক যে আবুল ফজল অতি যত্নে যাচাই করে এক একটি তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করে নিতেন। তবু যে তথ্য তিনি লিপিবদ্ধ করতেন তার নির্বাচন, মূল্যায়ন ও উপস্থাপন, বিচার্য সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামতের বর্ণে রঞ্জিত হত।

আবুল ফজল মেনে নিয়েছিলেন যে রাজশাসন প্রতিষ্ঠানটির উৎস ঐশ্বরিক। একটি আলোক যা ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। তাঁর পদমর্যাদার জন্য, নৃপতি সরাসরি ঈশ্বরের মহিমার কাছে অনুগৃহীত। সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিষ্ঠান না থাকলে, সমাজের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল সংঘাত-লিপ্ত শক্তিগুলি আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেদের ধ্বংস করবে। অবশ্য রাজশাসনকে, নৃপতির ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ, দেহোপভোগ ও ক্ষমতা লালসা পূরণের হাতিয়ার করা উচিৎ নয়। বরং সার্বভৌম প্রজার কল্যাণে নিজেকে সমর্পিত করবেন।[৩] তিনি বিরোধে লিপ্ত পৃথিবীর আইন শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখবেন। নৃপতি ন্যায়পরায়ণ, প্রাজ্ঞ এবং সাহসী হবেন। তাঁর প্রভূত দেহবলের অধিকার থাকা উচিৎ। সহনশীলতা, প্রসারিত মন এবং তীক্ষ্ণ ন্যায়বিচার বোধ আদর্শ নৃপতির প্রয়োজনীয় গুণ। আবুল ফজল, মহা সন্তোষে আকবরকে সেই আদর্শ নৃপতিরূপে পেলেন। তার চেয়েও বড় কথা, প্রজাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন দেখাশোনা করার জন্য আবশ্যক গুণ আকবরের ছিল।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শান্তি ও নিরাপত্তা ও সকলের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা, সংহতি, স্থিতিশীলতা ও সুশাসনের প্রতীক হিসাবে আবুল ফজলকৃত মুঘল সাম্রাজ্যের মূল্যায়ন, তাঁর মৌলিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ থেকে মনে হয় যে জনগণের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে অধিকৃত অঞ্চল প্রসারিত করার রাষ্ট্রনীতি আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয় ছিল। এই ভাবে আবুল ফজলের রাজনৈতিক মতামত, যা তাঁর রচনায় বারংবার ব্যাখ্যাত হয়েছে, মুঘলদের সাম্রাজ্য সংক্রান্ত নীতির যথার্থ প্রতিপন্ন করার কাজে লাগে।

মুঘল ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে আবুল ফজলের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এক প্রহেলিকা,

Scanned with CamScanner

যেমন ছিল তাঁর সমসাময়িকদের কাছে। *মাসির-উল-উমরা*-র লেখক আবুল ফজলের বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িকদের মতামতের প্রধান দিকগুলির সংক্ষেপসার করেছেন।[৪] একটি কালক্রমিক বিবরণীতে খান-ই-আজাম তাঁকে পয়গম্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলে বর্ণনা করেছেন। জাহাঙ্গিরও আবুল ফজল সম্পর্কে একই মত পোষণ করতেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে তিনি অবিশ্বাসী। তিনি হিন্দু, অগ্নি উপাসক, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন ও নাস্তিক এইসব অভিযোগও ছিল। তাহলেও, *মাসির-উল-উমরা*-র রচয়িতার মতে তিনি 'সবার সাথে শান্তি' সব ধর্মের কল্যাণগুণে বিশ্বাসী একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ ছিলেন বলাটাই সঠিক হবে। *আলামারা-ই-আব্বাসি* (*Alamara-i-Abbasi*)-র লেখক তাঁকে *নুকতাভি* বলেছেন।[৫] উরফি এই দুই ভাইকে মানুষকে ধর্মত্যাগের পথে পরিচালনা করার অপরাধে দায়ী করেছেন। স্বয়ং আবুল ফজলের স্বীকারোক্তি যে তিনি *সুলহ্-ই-কুল* (*Sulh-i-Kul*) পথ লাভ করেছেন।[৬] *আইন-ই-আকবরি*-র একটি অনুচ্ছেদে আবুল ফজল তাঁকে নিয়ে, সমকালীন সমর্থক ও বিরোধী, উভয়পক্ষেরই বিতর্কিত মতামতের উল্লেখ করেছেন। এগুলি কিছু বিশদ উদ্ধৃতি দাবি করতে পারে।

'যদিও এই মুহূর্তে মুবারকের পুত্র ক্ষোভের বস্তু এবং মানবজাতির অমঙ্গলের সঙ্কেতরূপে গণ্য, এবং তাঁকে নিয়ে প্রেম-ঘৃণা দ্বন্দ্বের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, সত্যান্বেষী ঈশ্বরের পূজারীরা তাঁর নাম দিয়েছে *আবুল ওঅহ্দাৎ* (*Abul Wahdat*), এঁদের হিসাবে তিনি পরম দাতার অনন্য সেবক। সাহসিকতায় শৌর্যবানরা তাঁর নাম দিয়েছে *আবুল হিম্মৎ* (*Abul Himmat*), এঁদের চোখে তিনি সম্ভোগে আত্মবঞ্চনাকারী এক বিস্ময়। প্রজ্ঞার ফরমানে তাঁর পরিচয় *আবুল ফিরাৎ* (*Abul Firat*), সুমহান কুলের অনুপম নমুনা। অজ্ঞতার কোলাহলপূর্ণ গহ্বর অমার্জিত দলের রচনায়, কেউ বলে তিনি বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন, মনে করে এই ঘূর্ণিস্রোতে তিনি নিমগ্ন, আবার অন্যরা তাঁকে সংশয়বাদ, ধর্মত্যাগে প্রবৃত্ত গণ্য করে, ভর্ৎসনা আর তিরস্কারে একযোগে কণ্ঠ মেলায়।

মোরে লয়ে শতকথা লোকমুখে ভাসে,
পৃথিবী চাহিয়া রয়, কি উত্তর আসে।

ঈশ্বর প্রশংসার্হ যে জীবনের বিচিত্র উত্থানপতন লক্ষ্য করেও আমি এই সম্মানজনক অবস্থান থেকে বিচলিত হইনি, কিংবা যারা দোষ দেয়, যারা গুণগান করে, কাউকেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে বিরত হইনি, তিরস্কার কি প্রশংসায় জিহ্বা কলুষিত করিনি।'[৭]

আইন-ই-আকবরি ও *আকবর-নামা* মন দিয়ে পড়লে অভিমত জন্মায় যে তিনি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একজন স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অন্তিম আবেদন হত যুক্তির পক্ষে। যারা ঐতিহ্য ও প্রচলিত প্রথার দোহাই পাড়ত, তারা তাঁর বিদ্রূপের পাত্র হত। তিনি এদের খেতাব দিয়েছিলেন *তকলিদি* (*Taqlidi*), প্রাচীন ঐতিহ্য আর উপদেশ অনুসরণকারী। তিনি এদের মূর্খ ও অজ্ঞ বিবেচনা করতেন। এক কথায়, রক্ষণশীল *উলমা*

Scanned with CamScanner

ছিল *তকলিদি*, কারণ তাদের আশ্রয় ছিল প্রাচীন রীতিনীতি, ধর্মবিধি আর পয়গম্বর পালিত ধর্মাচার। তারা বুঝতে ব্যর্থ যে কালাতিক্রমে, ধর্মীয় গ্রন্থ ও বিধিতে অভিব্যক্ত সত্য অচল হয়ে পড়ে, সময়োপযোগী থাকে না। সেই সঙ্গে এও মনে হয় যে আবুল ফজল যথার্থই একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর ও অন্যান্য ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে তাঁর মতামত বর্ণনা করা কঠিন। কিন্তু তাঁর রচনা থেকে পরিষ্কার যে তিনি এক অখণ্ড পরমেশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং সন্ত ও তাঁদের আধ্যাত্মিক কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পোষাকী ধর্ম, তার বিধি, কর্মের অনুপ্রেরণায় পালনীয় সামাজিক প্রথাকে তিনি সামান্যই মানতেন, বলতে গেলে সেগুলিকে বিদ্রূপই করতেন। ফলে, সাধারণভাবে মুসলমানরা এবং নির্দিষ্টভাবে রক্ষণশীলরা, ইসলামে তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ সঠিক প্রতিপন্ন করা যায় না। অভিন্ন পরমেশ্বরে বিশ্বাসী হয়েও তিনি পালনীয় ধর্মকে গুরুত্ব দিতেন না, তার আধ্যাত্মিক উপাদান বস্তুর ওপর জোর দিতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ধর্মীয় মতামত তাঁকে রক্ষণশীলদের সাথে মুখোমুখি সংঘাতে নিক্ষেপ করে। ইসলাম, পয়গম্বর, ঐতিহ্য ও মুসলমান বিধির শত্রুরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেন। তাঁর সামাজিক অবস্থান যে ঈর্ষণীয় নয় সেটা উপলব্ধি করে তিনি *আইন-ই-আকবরি* ও *আকবর-নামা*-য় তাঁর মতাদর্শগত অবস্থান ব্যাখ্যা, বিশদ ও ন্যায্য প্রতিপন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরিণতিতে এই রচনায়, তাঁর উদারপন্থী ধর্মীয় ধ্যান ধারণা, 'সবার সাথে শান্তি'-র উপদেশ ও ঐতিহ্যের তুলনায় বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর আস্থা নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর উদার মনোভাব, *আইন-ই-আকবরি*-র হিন্দুস্থানের জনগণ শিরোনামা একটি অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নোক্তরূপে অনুচ্ছেদের প্রধান লক্ষ্যবস্তুর সারসংক্ষেপ করা যায় ঃ

১। হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় বৈরী ও তিক্ততার প্রধান উৎস এই বিশ্বাস যে হিন্দুরা *শির্ক* (*Shirk*)-এ প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ তারা সাকার মনুষ্য ও তাদের মূর্তির সাথে দেবগুণ সংশ্লিষ্ট করে। আবুল ফজলের দৃঢ়োক্তি যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল। সযত্ন পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে হিন্দুরা একেশ্বর ধারণার অনুগামী।

২। এ সত্ত্বেও, ভুল ধারণার শিকড় গভীরে প্রোথিত, যা তিক্ত শত্রুতা এমনকি রক্তপাতে পরিণতি লাভ করেছে।

৩। ভুল ধারণার উৎস বহু।

(ক) পরস্পরের ভাষা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞতা।

(খ) গবেষণা ও অনুসন্ধানের পথে অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধিতে সংখ্যাগুরুর অনিচ্ছা।

(গ) বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে অগ্রসর হওয়ার স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রথাবিধির সাধারণ স্বীকৃতি, কারণ সাধারণের বিশ্বাস্ যে সযত্ন অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞান *কুফ্‌র* (*kufr*) তুল্য।

Scanned with CamScanner

(ঘ) বিভিন্ন ধর্মের বিদ্বান ও প্রাজ্ঞদের, সহানুভূতি ও সমঝোতার পরিবেশে মতবিনিময় ও গুণাগুণ বিচার করে বিতর্কিত বিষয় বিচারের উপযোগী মিলনক্ষেত্রের অভাব।

(ঙ) উদ্যোগ গ্রহণ ও স্বাধীন মতবিনিময়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে সুস্পষ্টরূপে সত্য জ্ঞাপনে জ্ঞানীগুণীদের সক্ষম করতে, এমনকি প্রথম নৃপতির পর্যন্ত ব্যর্থতা।

(চ) ইতরামি ও বর্বর আচরণ থেকে নিজেদের নিরস্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সুপ্রবৃত্তি ও জ্ঞান জনগণের ছিল না। তারা অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ, তাদের হত্যা ও অসম্মান করেছে। ধর্মীয় উৎপীড়ন যে অযৌক্তিক ও নিষ্ফল সেটা তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিরোধীরা যদি ভুল পথে চলত, তাহলেও অজ্ঞতার কারণেই ঘৃণা ও রক্তপাতের পরিবর্তে, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি তাদের প্রাপ্য ছিল।[৮]

দৃষ্টিভঙ্গির উপরি-উক্ত সারমর্ম থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে আবুল ফজল সম্পূর্ণ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার পক্ষে ছিলেন ও হিন্দুদের একেশ্বরবাদী মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, যুক্তির বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে, তিনি প্রচলিত মতামত ও বিশ্বাসকে বৈধ মানতে অস্বীকার করতেন। শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে অনুসন্ধানের দ্বারাই অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করা যায়। ধর্মীয় মতভেদের জন্য উৎপীড়ন নিষ্ফল ও অযৌক্তিক, কারণ *শির্ক* কর্মে অপরাধীরাও অজ্ঞতা হেতুই পাপ করেছে, ও সেই কারণে সহানুভূতির পাত্র। ঘৃণা ও শত্রুতার মূল ভ্রান্তিমূলক ধারণার অবসানকল্পে, বিভিন্ন ধর্মের বিদ্বান ও জ্ঞানীর স্বাধীন মতবিনিময়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তিনি নৃপতির হস্তক্ষেপের প্রবক্তা ছিলেন।

আবুল ফজলের বৌদ্ধিক ও ধর্ম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

ইতিহাস দৃষ্টি

আবুল ফজল, *আকবর-নামা*-র দ্বিতীয় গ্রন্থে, ইতিহাস ও ইতিহাস-রচনার ওপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছু বিস্তৃত আকারে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে মনে হয় যে দীর্ঘকাল ধরে ধর্ম ও দর্শন তাঁর বৌদ্ধিক কর্মভার অধিকার করে ছিল।[৯] ইতিহাস তাঁর কাছে কোনও বাড়তি আকর্ষণ নিয়ে আসেনি, বিষয়টির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ ছিল না। তাঁর কাছে এ পুরাণের চেয়ে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট ছিল না। ইতিহাস চর্চা বৃথা, অকারণ কালক্ষেপ। এই বিষয়ে অধ্যয়ন সত্যোপলব্ধি পথ প্রদর্শন করে না। তার ওপর যে ইতিহাস অতীতে লেখা হয়েছে, তা বহু ত্রুটিতে দুষ্ট। স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষীরা সেই ইতিহাস লিখেছিল, তারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভ্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে, সত্য মিথ্যা একাকার করেছে। রচয়িতাদের ভেতর যাঁরা সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা হতেন

Scanned with CamScanner

স্থূলবুদ্ধি ভালোমানুষ; খবরও রাখতেন অল্প। ফলে তাঁদের বিবরণ হত বিচারবুদ্ধিহীন ও হাস্যকর। আবার সময় অতিবাহিত হওয়ায় তথ্যের মূল উৎসগুলি অন্তর্ধান করেছিল। এইটা ছিল ইতিহাস রচনার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক, বিশেষ করে যে সময়ে ঐতিহাসিকদের যাচাই করে অনুসন্ধান করার উদ্দীপনার অভাব ছিল। তার ওপর, কোনও কোনও ঐতিহাসিক নিজে থেকেই কিছু জুড়ে দিতেন। মিথ্যা বিবরণ সম্বলিত ইতিহাস বহু পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। পর্যালোচনার মানসিকতা না থাকায় অতীত সম্পর্কে তাঁদের এমন একটি মনোভাব গড়ে ওঠে যা বিভ্রান্তিকর ছিল, মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ঐতিহাসিক রচনার এই অনির্দিষ্ট সমালোচনায়, ইসলাম ও ভারতে মুসলমান শাসকদের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল, আবুল ফজল, যাঁরা মুসলমানদের ভারত জয় ও মুসলমান শাসকদের কার্যকলাপের বিবরণ লিখেছেন, তাঁর সেই পূর্বসুরীদের সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত ছিলেন। তারা ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু ও ইসলাম অনুসারীদের মধ্যে একটি সংঘাতরূপে দেখত। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা দিয়েই তাঁর আগের ঐতিহাসিকরা মানুষকে বিভ্রান্ত ও ভারতীয় ইতিহাসের প্রভূত ক্ষতি করেছেন। আবুল ফজলের সমালোচনার লক্ষ্য, মনে হয়, ইসলামি ইতিহাসের সেই সব তথ্য ও প্রতিষ্ঠানের দিকেও ছিল যেগুলি তাঁর চোখে অসঙ্গত ঠেকেছিল।

মনে হয়, কোনও এক পর্যায়ে আবুল ফজল ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। বিষয়টি আদ্যোপান্ত পুনর্বিবেচনা করে, সেই অনুসারে তাঁর মনোভাব সংশোধন করেন। ক্রমশ তাঁর প্রত্যয় জন্মায় যে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা ও কীর্তি, যা ইতিহাসে নথিভুক্ত হয়েছে, আলোকপ্রাপ্তি ও প্রজ্ঞার একটি ইতিবাচক উৎস। তিনি নজরে আনলেন যে ইতিহাস মনীষী ও দার্শনিকদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লিপিবদ্ধ করে, এবং এইরূপে সেগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মে পরিবাহিত করে। সুতরাং ইতিহাসের সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিষয়টি চর্চার যোগ্য।

তার ওপর, আবুল ফজলের মতে, ইতিহাস অধ্যয়ন যুক্তিসঙ্গত বিচারবুদ্ধির পুষ্টি ও শক্তি জোগায়। *মকুল* (*maqul*) ও *মনকুল* (*manqul*) এর ভিতর তিনি একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক দেখেছেন। তিনি মেনে নিয়েছেন যে *ইরফান* অর্থাৎ সত্যোপলব্ধি মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য। সেটা কেবল মাত্র যুক্তির আলোকেই সম্ভব, কিন্তু যুক্তি স্বয়ং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আলোক পায়, নির্দিষ্টভাবে চক্ষু ও কর্ণের সাহায্যে। তাহলে স্পষ্টতই, অতীতবাসীদের দৃষ্টি ও শ্রবণের সহায়তায় যৌক্তিক বিচারশক্তি সমৃদ্ধ হয়।

পরিশেষে, ইতিহাস অধ্যয়ন একজনকে শোক ও দুঃখ অনুভূতি জয় করতে সাহায্য করে। আবুল ফজল ইতিহাসকে এক ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে একজনের শোক নিরাময় হয়, সে তার বিষাদের প্রতিকার পায়। এই জগৎ, যেখানে একের অপরের সাথে সম্পর্ক সাধারণত শোক ও বেদনায় পরিণতি লাভ করে, সেখানে ইতিহাস দুর্ভাগা, সন্তপ্তের সান্ত্বনা।

Scanned with CamScanner

অতীতে লিখিত ইতিহাস সম্পর্কে আবুল ফজলের অভিমতের উপরি-উক্ত সারমর্মে প্রকাশ পায় যে তিনি ইতিহাস রচনায় যুক্তি নির্ভর পথে অগ্রসর হওয়ার মহা গুরুত্ব দিতেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল যে ঐতিহাসিক রচনায় অন্তর্ভূক্ত তথ্য ও উক্তির ভিত্তি হবে মূল তথ্যসূত্র এবং সেই তথ্য কেবলমাত্র সযত্ন যাচাই, অনুসন্ধানের পরেই ইতিহাসে স্থান পাবে। কোনও ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের যদি যুক্তিনির্ভর পথ ও কল্পনা থেকে তথ্য বাছাই করার মনোবৃত্তি না থাকে তাঁর কাজ অসার হবে, কোনক্রমেই কল্পিত সৃষ্টি নিয়ে গল্প-সংগ্রহের চেয়ে উচ্চতর নয়। যে রচনা তথ্য ও কল্পনা একাকার করে, তাকে কোনমতেই ইতিহাস বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এটা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন যে তিনি ইতিহাসকে *তফসির* (*Tafsir*) বা *ফিখ* (*Fiqh*) সম্পৃক্ত শাখা গণ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার প্রবণতা তাঁর ছিল। তাঁর কাছে এ দুটি শুধু সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ই নয়, তারা একে অপরের পরিপূরক ও সম্পূরকও বটে। ইতিহাসের এই ধারণায় বরনি ও বদাউনি লালিত পথ ত্যাগ করতে হয়। তার ওপর, আবুল ফজল, ইতিহাসের কাজ শুধু 'বিশ্বাসী'কে জ্ঞানালোক দান ও সতর্ক করা, সাধারণত মুসলমান ঐতিহাসিকদের মেনে নেওয়া এই মত একবারও উল্লেখ করেননি। প্রতীয়মান হয় যে তাঁর ইতিহাস চিন্তার বৈশিষ্ট্য চিহ্ন ধর্মীয় নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষ।

ইতিহাস, আবুল ফজলের মতে, প্রমোদ ও পানোৎসবের সাথে যুদ্ধ ও অভিযানও নথিভূক্ত করে। গম্ভীর-অগম্ভীর উভয়কেই অঙ্গীভূত করে (কিন্তু আবুল ফজল অগম্ভীর বিষয় চর্চা করেননি); করুণা ও নিষ্ঠুরতা ঔদার্য ও নীচতা, শৌর্য ও ভীরুতা, সবই ইতিহাসে স্থান পায়; সে মানুষের অবস্থা ও সরকারের রাষ্ট্রনীতির বিবরণ; মনীষীর প্রজ্ঞা, বিদ্বানের শিক্ষা ইতিহাসে অন্তর্ভূক্ত হয়। আবুল ফজলের মতে, ইতিহাস তদুপরি পৃথিবীতে সংঘটিত সমস্ত পরিবর্তনের রূপদান করে।

আকবর-নামা ও *আইন-ই-আকবরি* একত্রে একটি অভিন্ন গ্রন্থ গঠন করেছে। *আকবর-নামা*-র প্রথমাংশে তাঁর পিতা হুমায়ুনসহ আকবরের পূর্বপুরুষদের একটি হিসাব আছে। দ্বিতীয় অংশে, ৪৬তম বছর অবধি আকবর শাসনের সম্পূর্ণ কালক্রমিক বিবরণ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১৫৯৫ সালে কাজ হাতে নেওয়া হয়, পাঁচবার পরিমার্জনের পর ১৬০২ সালে এটি সম্পূর্ণ হয়। *আইন-ই-আকবরি* গ্রন্থের তৃতীয় অংশ। 'অনুমোদিত সূত্রের অপর্যাপ্ত উপাদান থেকে লভ্য-ব্যাপ্তি, সংস্থান, অবস্থা, অধিবাসী, শিল্প ও সম্পদের পরিচয়মূলক যাবতীয় তথ্যরাশি সংবলিত, বিশ্বস্ত ও অনুপুঙ্খ বিবরণসহ এক বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিভাগের আদ্যোপান্ত প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনন্য সংকলন।'[১০] এতে আরও আছে, প্রাচীন গ্রন্থানুসারে হিন্দু ধর্মীয় ও দর্শন প্রণালী ও তাদের সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির বর্ণনা। এই পথে, আবুল ফজল ইতিহাসের পরিসর ও আলোচ্য বিষয় প্রসারিত করলেন। যা তাঁর পূর্বে, মধ্যযুগের কোনও ঐতিহাসিক করেননি।

Scanned with CamScanner

আবুল ফজল মধ্যযুগের প্রথম ঐতিহাসিক, যিনি আদি তথ্যসূত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি ও তাকে স্বীকৃতি দান ও সেগুলি অধ্যয়নে নিবিড় মনোনিবেশ ও যত্নদান করেন। তথ্যের সঠিকতা নিরূপণে তিনি একটি মাত্র উৎস বা বিবরণের ওপর নির্ভর করতেন না। গ্রহণের পূর্বে সেগুলি নিরীক্ষণ করা হত। তিনি বলেছেন যে তিনি একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করেন। কোনও ঘটনা বা তথ্যের প্রতিবেদকের সামনে এটা রাখা হত। তিনি নজরে এনেছেন যে এই পদ্ধতি সত্য নিরূপণে প্রভূত সাহায্য করে।[১১]

তাঁর তথ্য উপাদান হত প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা ঘটনা বিবরণ। আধিকারিক লিখিত প্রতিবেদন, স্মারক, কার্যবিবরণী, রাজকীয় *ফারমান* এবং অন্যান্য নথী সতর্কে দেখে নেওয়া হত। আকবর শাসনের ১৯শ বছর থেকে *ওঅকাই নবি*-দের হাতে নথিকৃত রাজদরবারের দৈনিক বিবরণী থেকে তিনি প্রচুর সংগ্রহ করতেন।[১২]

বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি সংবাদ, সামরিক অভিযান, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য ঘটনার বিবরণ ও প্রতিবেদন পেতেন।[১৩] প্রধান প্রধান আধিকারিক, অভিজাত অমাত্য, ওঅকিবহাল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও রাজপরিবারের প্রাচীন সদস্যদের কাছে তিনি খোঁজ নিতেন। বিরোধপূর্ণ মৌখিক বিবরণে খুশি না হতে পেরে, তিনি এঁদের লিখিত আকারে বিবরণ বেশ করতে অনুরোধ করতেন। এভাবে তিনি অনুগ্র, পরিমিত, ন্যায়নিষ্ঠ প্রকৃতির জন্য খ্যাত বিশজন ব্যক্তির কাছ থেকে লিখিত বিবরণ পেয়েছিলেন। তিনি বিবরণগুলি সযত্নে পরীক্ষা করে, যুক্তির বিচারে খতিয়ে দেখতেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট প্রাপ্ত বিরোধী প্রতিবেদন, সম্রাটের কাছে দাখিল হত। তিনি একটি নির্দিষ্ট বিবরণ দেখতেন অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতেন। একভাবেই লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অবগত তথ্যের সাথে যে বিবরণ মিলত না সেগুলিও সম্রাটের কাছে উল্লিখিত হত। ইতিহাস অনুসন্ধানের এই প্রক্রিয়ায় সত্য নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ হত।[১৪]

ঐতিহাসিকের ভূমিকায় আবুল ফজলের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল, বহুলাংশেই যে অবস্থার অধীনে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল তা দিয়ে। তাঁর সীমাবদ্ধতা ও কৃতি উভয়ের কারণের সন্ধানই তাঁর সামাজিক অবস্থিতি, শিক্ষা প্রাপ্তির ধারা, লব্ধ শিক্ষা, যৌবনের অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতে পাওয়া যাবে। সে যুগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঘটনায় তাঁর সক্রিয় আগ্রহ ছিল। এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বিশাল কাজে বিষয়বস্তুর বিচারকে রূপ দিয়েছিল।

প্রথমত, আগে দেখা গেছে যে তিনি আকবরের প্রিয়তম সভাসদ ও নতুন মুঘল সাম্রাজ্যের ধারণাকে যে শক্তি চ্যালেঞ্জ করে তাদের বিরুদ্ধে আকবরের বন্ধু ও সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন আকবরের বিশ্বস্ত সচিব, অন্তরঙ্গ বয়স্য। একই সাথে, তাঁর রচনা দৃঢ় মত দেয় যে তিনি নিখাদ মানসে আকবরের চরিত্র, ব্যক্তিত্বের প্রতি স্তুতি ও শ্রদ্ধাভাব পোষণ করতেন। এরূপ মনোভাবের প্রেরণা, কিছুটা ছিল হয়ত ব্যক্তিগত উন্নতির বিবেচনা। কিন্তু লক্ষ্য করা জরুরি যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত আকবরের অনুরূপ ছিল। ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উৎস ছিল তাঁর গড়ে

Scanned with CamScanner

ওঠার বছরগুলিতে যখন তিনি ও তাঁর পরিবার রক্ষণশীল *উলমা*-র নিকৃষ্ট উৎপীড়নের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তার ওপর আকবর যে মেধা ও হৃদয়ের উচ্চ ও মহত্তম গুণরাজির অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে কম মানুষই প্রশ্ন তুলবে। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে আবুল ফজল আকবরের মধ্যে একাধারে নৃপতি, দার্শনিক ও নায়কোচিত গুণের সন্ধান পেয়েছিলেন। আকবরের স্তুতি করার কারণ যাই হোক না কেন, সত্য এটাই যে তিনি আকবর-সূচিত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি নীতি-প্রণালীর সাথে একাত্মতা লাভ করেন। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও তিনি আকবরের সাথে সহমত ছিলেন। সমসাময়িক সূত্রগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করলে অভিমত জন্মায় যে আকবরের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক রাষ্ট্রনীতির পেছনে প্রকৃত মানুষটি হয়ত তিনি নাও হতে পারেন; তথাপি দৃঢ়ভাবে নীতিতে অটল থাকতে তিনিই সম্রাটকে নৈতিক ও বৌদ্ধিক সমর্থন জুগিয়েছিলেন। নিজের সরকারি অবস্থান এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামতের খাতিরে, আকবর ও তাঁর কর্মকাণ্ডকে সমর্থন, যথার্থ প্রতিপন্ন ও তার গুণগান করা আবুল ফজলের পক্ষে উচিত ছিল। আদর্শ সম্রাটের কাজকর্ম ও কীর্তি লিপিবদ্ধ করা তাঁর কাছে পূজনীয় কাজ ছিল।[১৫] সেই হেতু এই আখ্যান, তথ্যের খুঁটিনাটিতে সঠিক হলেও, লেখা হয়েছিল এক একদেশদর্শী উদ্যমে, আকবরের ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষা করে তাঁর কৃতির গুণগানের লক্ষ্যে। এই কর্তব্য সাধনে তিনি তাঁর মেধা, বিচারবুদ্ধি, অধীত বিদ্যা ও ভাষা প্রয়োগের অসামান্য ক্ষমতা নিয়োগ করেন। বিষয়বস্তুর বিশালতা, মানুষের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সে যুগের মহাঘটনাবলী ও আকবরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে মহাকাব্য রচনার মর্মকাহিনী ও বিষয়সম্ভার উপহার দেয়। আবুল ফজল, ভাষার ওপর তাঁর অসামান্য দখলের সহায়তায়, ইতিহাস ও মহাকাব্য একত্র করে একটি অভিন্ন সাহিত্য খণ্ড রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর সাফল্যে কেউ সন্দেহ করবে না। ঐতিহাসিক হিসাবে এটাই তাঁর সাফল্যের, এবং ব্যর্থতার মাত্রা।

এই সাহিত্যিক প্রয়াসের ফলে আকবর শাসনের একটি অতি বিশদ ও সম্পূর্ণ হিসাব আমাদের হাতে এল। ঐতিহাসিকের ভূমিকায় আবুল ফজলের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় কৃতিত্ব হল একটি গ্রন্থ রচনা যা পাঠ করলে মহাকাব্যের আস্বাদ মেলে। এতে স্থাপত্যের বিশালতার আভাস পাওয়া যায়, আকবর অট্টালিকার শীর্ষ খণ্ডরূপে বিরাজ করেন। *আকবর-নামা* ও *আইন-ই-আকবরি*-র পাতায় পাতায় আকবরের বিশালতাকে দৃঢ় রূপ দান করা হয়েছে। তাঁর অসাধারণ নৈতিক সাহস, আধ্যাত্মিক বাসনা, সুদূর দৃষ্টি ও গভীর তীক্ষ্ণ বোধশক্তি এতে প্রতিফলিত হয়েছে। আকবরের দৈহিক বল ও সাহস, করুণা ও কঠোর ন্যায়বোধ, তাঁর 'সুভাগ্য' (*ইকবাল*)-এর সম্ভ্রম ও রাজকীয় মহিমা পাঠককে অভিভূত করে।

এই গ্রন্থে সাম্রাজ্য নিয়ে আকবরের নতুন ধারণা, উপযুক্ত বলিষ্ঠ প্রশাসনিক পদক্ষেপের সাহায্যে জনগণের অবস্থার উন্নয়নে তাঁর অক্লান্ত আগ্রহ, ধর্মে সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতার মহান আদর্শ ও প্রয়োগ এমনই ভাষায় বর্ণিত যা আকবরকে অমর করে

Scanned with CamScanner

রেখেছে। তিনি, ভারতের মানুষের কাছে, প্রজার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সর্বাপেক্ষা বদান্য ও সফল নৃপতিদের অন্যতমরূপের মধ্যে প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছেন। এটা কোনও সামান্য কৃতিত্ব নয়। কম ঐতিহাসিকই এই সৌভাগ্যের অধিকারী। নিঃসন্দেহে আবুল ফজল তাঁর মহাগ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত প্রারব্ধ কর্ম যথাযথভাবে পালন করেছেন।

আকবরের ইতিহাস রচয়িতারূপে এটাই আমার কাছে তাঁর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ কীর্তি বলে মনে হয়। সমসাময়িক ইতিহাস বিচারেও তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ধারা থেকে তিনি বহু ক্ষেত্রেই দূরে সরে আসেন। তিনি মনে করতেন না যে ভারতের ইতিহাস শুধু এদেশের মুসলমান শাসকদের কীর্তি নিয়েই চর্চা করবে; ইসলামের অতীতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও তিনি করেননি। ভারতীয় ইতিহাস মূলত মুসলমান ও হিন্দু শক্তির মধ্যে সংগ্রামের উপাদানে গঠিত, তাঁর পূর্বসূরীদের লালিত এই মত তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আবুল ফজলের কাছে এ ছিল মুঘল সাম্রাজ্য ও ভারতীয় রাজন্যবর্গ—হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই লড়াই। মর্মে এ ছিল প্রজাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নেতৃত্ব দানের গুণসম্পন্ন এক সম্রাটের অধীনে স্থিতিশীলতা, সংহতি ও সুশাসন পক্ষের শক্তির সাথে 'জমিদার'-দের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতা ও কুশাসন পক্ষের শক্তির সংঘাত। আকবর ও আবুল ফজলের বিচারে মুঘল সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য, কোনও বর্ণগোষ্ঠীর, তাদের জোট বা শুধু বিশ্বাসীদের একান্ত বিষয় নয়। হিন্দু ও রাজপুত সামন্ত অভিজাতদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবির স্বীকৃতি দানের পর, রাজকীয় মৈত্রীসঙ্ঘে তাঁদের সামিল না হওয়ার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। এতে দেশে ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে। রাজপুতদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনকালে, আবুল ফজল এই বক্তব্য স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

রাজকীয় বাহিনীর যোদ্ধাবোধক শব্দপঞ্জীতে ভারতের ইতিহাসে এই নতুন দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে। আবুল ফজল তাঁদের *মুজাহিদান-ই-ইকবাল* (*mujahidan-i-iqbal*) ও *গাজিয়াঁ-ই-দৌলত* (*ghaziyan-i-daulat*) নামে উল্লেখ করেছেন, তারা আর *মুজাহিদান-ই-ইসলাম* (*mujahidan-i-islam*) ও *গাজিয়াঁ-ই-ইসলাম* (*ghaziyan-i-islam*) নয় অর্থাৎ তারা আর ইসলামের অভিযানে আত্ম জাহির করা বিজয়ী সেনা রইল না। সমসাময়িক ইতিহাসের এই বিচার, মধ্যযুগের ইতিহাস রচনায় এক নতুন সুর আনল। ইতিহাস চিন্তায় এটি একটি সুনির্দিষ্ট অবদান। নিঃসন্দেহে সত্য যে আবুল ফজলের নতুন ইতিহাস-ধারণা কিছুকালের জন্য ধর্মান্তকরণে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। তা সত্ত্বেও, ভারতের ইতিহাস নিয়ে তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গি দীর্ঘস্থায়ী মূল্য বহন করে। মুঘল সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি জনপ্রিয় করতে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল। রাজকীয় আধিকারিক ও হিন্দু সামন্তদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ওপরও এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল। শেষ অবধি, আবুল ফজলকৃত ভারতীয় ইতিহাসের ধর্মনিরপেক্ষ ভাষ্য জমিতে শেকড় পেয়েছিল। পরবর্তী মুঘল শাসকদের ঐতিহাসিকরা, হিন্দু কিংবা

Scanned with CamScanner

মুসলিম, উভয়েই মুঘল সাম্রাজ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও বিরোধীদের ওপর দৃষ্টিপাত করতেন।

হিন্দুদের প্রাচীন দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রণালী ও তাদের সামাজিক প্রথা-বিধি সম্পর্কে আবুল ফজলের আগ্রহ কম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। যত্ন সহকারে, সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তিনি হিন্দু সমাজের এই দিকগুলিতে লক্ষ্যপাত করেন। এই নিরীক্ষণ তাঁর রচনার বস্তুনিষ্ঠা ও নিস্পৃহ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আল-বিরুনির পর, যথাযথ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নিয়মানুগ পদ্ধতিতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে বোঝার এটাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা। অধিকন্তু, তার অতীত ইতিহাসকে মনে রেখে, সমসাময়িক হিন্দু সমাজকে বোঝার লক্ষ্যে তাঁর প্রয়াস, এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক ছিল যা আধুনিক সমাজ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে অনেকাংশে মেলে।

এই সব কীর্তি আবুল ফজলকে মধ্যযুগ ভারতের অগ্রণী ঐতিহাসিককুলে বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে। তাহলেও, ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজলের বাস্তবসম্মত মূল্যায়ণ ও ভূমিকা নির্ধারণে তাঁর কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা উচিৎ। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যে সব ঘটনার খুঁটিনাটির সত্যতা নিরূপণ করেছিলেন বলে মনে হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু কোনও বিষয় বিচার করতে গিয়ে তিনি বস্তুগত বিচারের চেয়ে নিজস্ব মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর বাগবৈশিষ্ট্য, ব্যবহৃত বিশেষণ, বাক্যগঠন থেকেই কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামতের আভাস পাওয়া যায়। এই আখ্যানে এক ব্যক্তি, ঘটনা বা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর স্বকীয় বিচার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। একজন রাজপুত সামন্ত বা কোনও মুসলমান নৃপতির বিরুদ্ধে অভিযানে আকবরের কোন উদ্দেশ্য তাঁর প্রেরণারূপে কাজ করেছিল, অনিবার্যভাবেই আবুল ফজল সেটা ব্যাখ্যা করেছেন। এই উদ্দেশ্যগুলি ন্যায়সঙ্গত ও অভিনন্দনযোগ্য বলে বর্ণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এই ধরণের বিচার ঐতিহাসিক বস্তু নির্ভরতার শর্ত পালন করে না।

এভাবে, আবুল ফজল একদিকে যুক্তিকে তাঁর একমাত্র পদনির্দেশক ও কর্মবিধানের স্থান দিয়েছেন এবং যুক্তির পরিবর্তে যাঁরা প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করেন তাঁদের বিদ্রূপ করেছেন, অন্যদিকে, আকবরকে বিচার করতে গিয়ে তিনি এই মানদণ্ড প্রয়োগ করেন নি। আকবরের অসাধারণ গুণাবলী আলোচনায় বা তাঁর দূরদর্শিতা উল্লেখকালে যা ভবিষ্যৎবাণী বা প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, অথবা আকবরের 'সুভাগ্য'-এর প্রাপ্তি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আবুল ফজল যুক্তির বাণীতে কর্ণপাত করেননি। এই দুর্বল মুহূর্তগুলিতে আবুল ফজলের সাহচর্য বেদনাদায়ক। মনে হয়, যুক্তির মহাদূত যেন সরল বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বলি হয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে যে কখনও কখনও আকবরের প্রজ্ঞা বা সামর্থ্যের সুনামহানি করতে পারে এরূপ কিছু ঘটনা ও তথ্যের উল্লেখ তিনি কোনও ওজুহাতে এড়িয়ে গেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, *আকবরনামায় জাগির (jagir)* জমিকে *খালিসা*

Scanned with CamScanner

(*Khalisa*) জমিতে রূপান্তর ও *কাওরি* (*kaori*)-দের হাতে ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণের প্রকল্পের চরম ব্যর্থতার কথা বলা হয়নি; এর পরিণতিতে যে বিশাল আবাদী এলাকা ও কৃষকের সর্বনাশ হয় এবং শেষ অবধি *কাওরি*-রা হয়রান ও দণ্ডিত হন সে কথা উল্লেখ করা হয়নি। আবুল ফজলের নীরবতা অশুভ; তিনি *কাওরি*-দের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি বাক্যও লিখতে পারেন নি। তিনি এও নজরে আনেন নি যে এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, রাজত্বের ২৪শ বছরে *জাগির* মঞ্জুর পুনরায় শুরু হয়। বদাউনি কিন্তু এইসব তথ্য নথিভুক্ত করেছেন এবং নিজাম-উদ-দিন আহমদ এর মর্ম সমর্থন করেছেন। *আকবর-নামা*-য় হুবহু অন্তর্ভূক্ত, টোডর মল (Todar Mal) ও শাহ ফাথুল্লাহ্ শিরাজি (Shah Fathullah Shirazi)-র প্রতিবেদন পরোক্ষে বদাউনি ও নিজাম-উদ-দিনের বিবরণের সত্যতা স্বীকার করেছে।

তেমনই, *খলিশা* ও *জাগির* জমি থেকে *মদদ-ই-মাশ* (*madad-i-maash*) আলাদা করার রাজকীয় আদেশের সংক্ষেপসার ছাড়া *সদ্‌র* বিভাগে প্রবর্তিত সংস্কারের-দীর্ঘ কালব্যাপী কর্মসূচী *আকবর-নামা*-য় স্থান পায়নি। বোঝা কঠিন আবুল ফজল কেন *আইন-ই-আকবরি* গ্রন্থে পুনর্গঠনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণমাত্র অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই বিবরণগুলিতেও, *সদ্‌র*-এর ক্ষমতা খর্বকারী কঠোর সংস্কারগুলি এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র *সদ্‌র* বিভাগে প্রচলিত দুর্নীতিগ্রস্ত রীতিগুলি স্থূলভাবে সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। আবুল ফজল সুচিন্তিতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর এই পদক্ষেপগুলির পরিণতির বিষয়টি তাঁর রচনা থেকে বাদ দিয়েছেন। এই শ্রেণীর মুখপাত্ররূপে বদাউনি *মদদ-ই-মাশ* (*madad-i-maash*)-এর অধিকারীদের ওপর এগুলির বিরূপ প্রভাব ও তাদের তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ার সর্বাঙ্গীণ ও প্রত্যয়যোগ্য বিবরণ দিয়েছেন।

আবার, ইবাদৎখানায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় আলোচনা, *উলমা*-র প্রতি আকবরের নিদারুণ বিরাগের উৎস, তাদের সাথে সম্পর্কছেদ এবং আকবরকে *মুজতাহিদ* বা *ইমাম-ই-আদিল* রূপে ঘোষণার বিবরণ কোনক্রমেই পূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ বলা যায় না। আবুল ফজল এই বিতর্কে একটি পক্ষ নিয়েছিলেন এবং যুক্তির লড়াইয়ে *উলমা*-কে হেয় প্রতিপন্ন করে ক্ষমতা ও প্রভাবের আসন থেকে অপসারণ করার প্রক্রিয়ায় প্রধান হাতিয়ার ছিলেন। স্বাভাবিক যে এই প্রচণ্ড ধর্মীয় বাদানুবাদ নিয়ে তাঁর বিবরণ সমদর্শী ও বস্তুনির্ভর গণ্য হতে পারে না। তার ওপর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি *উলমা*-র প্রতি অবজ্ঞা-বিদ্রূপে ভরা, অবশ্য সূক্ষ্ম-মার্জিত ভাষার মোড়কে। এসব সত্ত্বেও *উলমা*-র মূল্যবোধ ও অনুসৃত নীতির প্রতি তাঁর বদ্ধমূল বিরাগ সবিক্রমে, সুললিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। সত্য যে আবুল ফজল অতি নিষ্ঠার সাথে মানুষ বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু তাঁর শক্তিশালী লেখনী তখন *উলমা* শ্রেণীর বিরুদ্ধে পুরাতন ক্রোধের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এটা মানা যায় যে তখন *উলমা* যেসব নীতির পক্ষে দাঁড়াত, নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেগুলি তখন সজীবতা, স্বীকৃতি সবই হারিয়েছে; এমনকি

Scanned with CamScanner

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের বিশ্বাসে যুক্তি ও প্রজ্ঞার সব কিছুতেই খণ্ডনের আভাস মেলে। তা হলেও, আবুল ফজলের ভাষায় যুক্তি দেওয়া যায় যে তাঁরা ছিলেন অজ্ঞতার শিকার এবং সেহেতু নিগ্রহ আর ইতিহাসের পাতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্থলে তাঁরা সুবিবেচনা ও সহানুভূতি পেতে পারতেন। সেই সব অনুচ্ছেদে আবুল ফজল সহিষ্ণুতা ও উদারপন্থার সেই নীতিগুলিই দৃকপাতহীনভাবে লঙ্ঘন করেছেন, যা তিনি অন্যত্র, অন্য প্রসঙ্গে কি নিষ্ঠার সাথেই না মেনে নিয়ে প্রচার করেছেন। ঘটনা এই যে এটা যতখানি ছিল ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী *উলমা*-র সাথে নিঃসম্বল যোগী জীবনে প্রত্যাবর্তী অতীতের ফকিরদের মতাদর্শের সংঘাত ততটাই ছিল ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। উত্তরবর্ণিত যখন ক্ষমতায় এলেন তাঁরাও সমমাত্রায় *উলমা*-র বিরুদ্ধে তরবারি ও লেখনীর অক্লান্ত প্রয়োগে মত্ত হলেন যেমন পূর্বোক্ত তাঁদের বিরুদ্ধে হয়েছিলেন। তাঁরা সতর্ক ছিলেন *উলমা*-র সব শক্তি যেন চূর্ণ হয়, ইতিহাসে তাদের নাম যেন লেখা থাকে মূর্খ, স্বার্থপর, নীচ, আত্মপরায়ণ কয়েকজন লোক হিসাবে।

বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়, যেখানে আবুল ফজল ঐতিহাসিকরূপে তাঁর পালনীয় কর্তব্যের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপে, শের শাহর বিবরণ— এই ধরণের একটি বিষয়। তাঁর কীর্তি ছোট করে দেখানো হয়েছে, তাঁর সাফল্যের কারণরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, তঞ্চকতা। কোনও আধুনিক ঐতিহাসিক শের শাহর এই মূল্যায়ণে একমত হবেন না। তাঁর প্রবর্তিত কোনও কোনও সংস্কার উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু এগুলিকে ছোট করার উদ্দেশ্যে আবুল ফজল তড়িঘড়ি যোগ করেছেন যে ওগুলি আলা-উদ-দিন খলজি বা বাংলার শাসকদের অনুকরণে করা হয়েছিল।

আবুল ফজলের ধ্যানকর্ম জুড়ে আকবর ও তাঁর কাজকর্মের উপস্থিতির ফলে বহু তথ্য বাদ পড়ে গেছে যা থাকলে প্রশ্নের অন্যদিকও সামনে এসে তাঁর বিবরণকে যথাযথ প্রেক্ষাপটে স্থাপন করত। আমরা কাহিনীর আফগান ও রাজপুত দিক, তাঁরা কি অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে আকবর সফল হয়েছিলেন, কিন্তু তীব্র কূটনৈতিক প্রয়াস ও সামরিক তৎপরতার ছাড়া নয়, এই সব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না। ফলে *আকবর-নামা*-য় উপস্থাপিত রাজনৈতিক হিসাবনিকাশ হিন্দুস্তান সাম্রাজ্যের জন্য মরণপণ লড়াইকে প্রাণবন্ত বর্ণময় রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর আখ্যান পড়ে মনে হয়, এ যেন আমাদের বিশ্বাস করানোর প্রয়াস যে আকবরের সুভাগ্য (*iqbal*) ও তাঁর চমকপ্রদ সামরিক বল নিশ্চেষ্ট, বিরোধী শক্তিকে হেলায় জয় করে; মুঘল সেনার বিজয়ী সামরিক তৎপরতার পশ্চাৎপটের ভূমিকা পালন ছাড়া তারা আর কিছুই করেনি। *আকবর-নামা*-র বিবরণ পড়ে অনিবার্যভাবে এ ধরণের যে ধারণার জন্ম হয়, তাতে আকবরকে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল তার বাস্তবতা উপলব্ধি হয়না। কারণ তাঁর দূরদৃষ্টি, কূটনৈতিক দক্ষতা ও সফল সামরিক অভিযান সংগঠিত করার ক্ষমতাই তাঁকে সাফল্য এনে দেয়, আবুল ফজল যেমন আমাদের বিশ্বাস

Scanned with CamScanner

করাতে চেয়েছেন শুধু মাত্র তাঁর সেই সুভাগ্য নয়।

এও লক্ষ্য করা জরুরি যে হিন্দুস্তানের ন্যায়সঙ্গত সম্রাটরূপে আকবরকে যারা চ্যালেঞ্জ করেছিল, আঞ্চলিকতা, স্থানীয় দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা এবং জাতি-সংঘাতের পক্ষাবলম্বী সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিশ্বস্ত বিবরণ দিতে আবুল ফজল ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে, সে যুগের বিভিন্ন ধরণের সংঘাতের গভীরতা, মাত্রা ও তীব্রতা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়নি।

তার ওপর, সম্রাট, অভিজাত, পণ্ডিত, সাধুসন্তদের নিয়ে তাঁর ধ্যান আচ্ছন্ন থাকায়, জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সঙ্কীর্ণ ছিল। অন্তরের বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল যাকে অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ জ্ঞান করতেন সেই ঘটনা বা তথ্যের প্রতি তিনি নজর দিতেন না। এই তথ্যগুলি, নথিভুক্ত হলে, সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে বিরল অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করত এবং তৎকালীন যুগমানস হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁকে সাহায্য করত। তাঁর বৌদ্ধিক পক্ষপাত, বিদ্বানরূপে শিক্ষণ, জীবনের অগম্ভীর, নম্র, সাধারণ বিষয়ের প্রতি তাঁকে অবজ্ঞাপূর্ণ উদাসীন করে তোলে। পরিণতিতে সাধারণত সেইসব বিষয়েই তাঁর কৌতূহল রয়ে যায় যেগুলি নৃপতি, অভিজাত বা দার্শনিক অনুমান অনুসন্ধানে কৃতি বিদ্বানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ববাহী হত। এবং এই তথ্যগুলি নির্বাচন করে সমান গম্ভীর, সমারোহপূর্ণ চাঁছাছোলা ভাষায়, লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জীবনের উচ্চ, গভীরতর সত্যগুলি বেছে নিয়েছেন এরূপ দার্শনিকের পক্ষে যথাযোগ্য মাধ্যমে পেশ করা হত। নীট ফল, *আকবর-নামা* ও *আইন-ই-আকবরি*-র পাতায় পাতায়, প্রসারিত অর্থে যুগের জীবন, গভীর-অগভীর, উঁচুনিচু, গম্ভীর-কৌতুকপূর্ণ, সরল-রঙীন রূপ-বর্ণ নিয়ে স্পন্দিত হয়নি। সত্য যে *আইন-ই-আকবরি*-তে প্রচুর অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি রয়েছে, কিন্তু এই সব তথ্য পড়তে রেলের টাইম টেবিলের মত লাগে, কিংবা একটি বিভাগীয় প্রতিবেদন, যাতে মানুষের প্রকৃত অবস্থা, তাদের জীবনের উপাদান, লক্ষ্য ও অর্থ সম্পর্কে যা কিছু আমাদের অবহিত করতে পারত সবই বর্জিত হয়েছে। আবুল ফজল কখনই মজুরি ও দাম, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মানব প্রসঙ্গে রাজস্বের চাহিদার কথা জানান নি। *আইন-ই-আকবরি* আমাদের শুধু কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছে যার সাথে মানুষের জীবনযাপনের কোনও সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। সেই রকম, সাধারণ নরনারীর রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস, সামাজিক আচার-বিচার, কুসংস্কার নথিবদ্ধ করাকে, আবুল ফজল এক বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মর্যাদাহানিকর মনে করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, বৌদ্ধিক পক্ষপাত থেকে উদ্ভূত সীমাবদ্ধতা তাঁর সৃষ্ট যুগ কাহিনীটিকে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ রেখে গেছে। *আকবর-নামা* নিতান্তই আকবরের কাহিনী, যে যুগ ও সমাজে আকবর ও আবুল ফজলের জীবন কেটেছিল তার কাহিনী নয়। এবং এই অর্থেই আবুল ফজল যুগমানসকে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছেন, একটি সমাজকে সুসংহত এককের রূপে তুলে ধরতে পারেন নি।

Scanned with CamScanner

টীকা ও উল্লেখপঞ্জী

১. আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরি*, (লক্ষ্ণৌ, ১৮৯৩), খণ্ড III, ২০৭-১৬।
২. আবুল ফজল, *আকবর-নামা* (Bib-Ind.), খণ্ড II, ৩৮৭-৮৯; *আইন-ই-আকবরি*, খণ্ড III, ২১৭।
৩. *প্রাগুক্ত*, খণ্ড I, ২-৩; *প্রাগুক্ত* খণ্ড I, ২০১-০২।
৪. *মাসির-উল-উমরা*, বেভরিজ, খণ্ড I, ১১৭-২৮ (*Maasir-ul-Umara*, Beveridge)।
৫. *নুকতাভি* (*Nuqtavis*); এঁরা জগৎকে অবিনশ্বর মনে করেন ; পুনরুত্থান ও অন্তিম দিবস এবং পাপ পুণ্যের প্রতিদান মানো না। এঁরা স্বর্গোদ্যান ও নরকের অর্থ করেছেন সমৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা।
৬. *আইন-ই-আকবরি*, খণ্ড III, ২১৮।
৭. *প্রাগুক্ত*, ২২৩-২৪।
৮. *প্রাগুক্ত*, ২-৪, এবং *আকবর-নামা*, খণ্ড II, ৬৫৯-৬০ দ্রষ্টব্য।
৯. *প্রাগুক্ত*, খণ্ড II, ৩৭৬-৯২।
১০. *আইন-ই-আকবরি*, জ্যারেট (Jarrett), ভূমিকা।
১১. *আকবর-নামা*, খণ্ড II, ৩৬৭-৯২।
১২. *প্রাগুক্ত*, খণ্ড I, ৯-১০।
১৩. *আইন-ই-আকবরি*, খণ্ড III, ১৯৯-২০০; *আকবর-নামা*, খণ্ড I, ৯-১০
১৪. *আইন-ই-আকবরি*, খণ্ড III, ১৯৯-২০০।
১৫. *আকবর-নামা*, ভূমিকা।

Scanned with CamScanner